بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

সংখ্যা
10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 9 ই মার্চ, 2017 9 আমান,1396 হিজরী শামসী 9 জামাদিয়উস সানি 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিকে বেঈমানী মনে করি। আমর ধর্ম বিশ্বাস এটিই, যে এগুলিকে বিন্দু পরিমাণ ছেড়ে দিবে সে জাহান্নামী। অতঃপর অমি এ বিশ্বাসকে কেবল বক্তৃতা নয় বরং নিজের লেখা প্রায় ষাটটি রচনায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। আমি যথার্থতার সঙ্গে খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। তারা আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীমের উপর সেভাবে ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের রাখা উচিত। আমি এক বিন্দু পরিমাণও ইসলামের বাইরে পা রাখাকে ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আমি অত্যন্ত পরিতাপ এবং ব্যথিত হৃদয়ে বলছি যে, জাতি আমার বিরোধিতায় কেবল তাড়াহুড়াই করে নি বরং অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাও দেখিয়েছে। কেবল 'ওফতে মসীহ'-এর একটি বিষয়ে বিরোধ ছির, যার সম্পর্কে আমি কুরআন করীম, আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত, সাহাবাদের ইজমা,সাধারণ জ্ঞানের দলিল এবং বিগত পুস্তকাদি থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলাম এবং এখনও করছি। হানাফী সম্প্রদায় অনুযায়ী হাদীসের অকাট্য হুকুম, কিয়াস এবং শরীয়তের দলিলসমূহ আমার পক্ষে ছিল। তথাপি ঐ সকল ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এ বিষয়টি সঠিকভাবে জানা এবং দলিলসমূহ শুনার পূর্বেই বিরোধীতায় এত বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে, আমাকে কাফের আখ্যা দেয়। সেই সঙ্গে আরও যা ইচ্ছা বলে এভং আমাকে দায়ী করে। আমানতদারী, নেকী এবং তাকওয়ার চাহিদা এই ছিল যে, প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিত। আমি যদি আল্লাহ্‌ এবং রসূলের কথা অমান্য করতাম তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের অধিকার ছির, আমাকে যা ইচ্ছা বলার, 'দাজ্জাল' কায্‌যাব' ইত্যাদি। কিন্তু আমি শুরু থেকে বর্ণনা করে আসছি যে, আমি কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিকে বেঈমানী মনে করি। আমর ধর্ম বিশ্বাস এটিই, যে এগুলিকে বিন্দু পরিমাণ ছেড়ে দিবে সে জাহান্নামী। অতঃপর অমি এ বিশ্বাসকে কেবল বক্তৃতা নয় বরং নিজের লেখা প্রায় ষাটটি রচনায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। রাত দিন আমার এই চিন্তা ছিল এবং খেয়াল থাকে। এই বিরোধীরা যদি আল্লাহ্‌ তা'লাকে ভয় করতো তাহলে তাদের কি জিজ্ঞাসার করা উচিত ছিল না যে, অমুক বিষয় ইসলাম বহির্ভূত, এটির কারণ কি? অথবা তুমি এটির জবাব কি দিচ্ছ? তারা এরূপ না করে কাফের সাব্যস্ত করতে বিন্দু পরিমাণ ভ্রক্ষেপ করল না। শুনল এবং কাফের আখ্যা করে দিল। আমি অত্যন্ত আশ্চাযান্বিবত হয়ে তাদের এই কর্মকে অবলোকন করছি। কেননা, প্রথমতঃ মসীহ্‌র জীবিত বা মৃত্যুর বিষয়টি এমন কোন বিষয় নয় যা ইসলামে প্রবেশের শর্তস্বরূপ। এখানেও হিন্দু অথবা খৃষ্টান মুসলমান হয়ে থাকে কিন্তু বল, (মুসলমান হওয়ার জন্য) নিম্নের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোন স্বীকারোক্তি নিয়ে থাক কি?

'আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রসুলিহী ওয়াল কাদরি খায়রিহী মিনাল্লাহি তা'লা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত'

(অর্থঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশতা কিতাবসমূহের উপর, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভাল মন্দ তকদীদেরর উপরে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দিবসে।-অনুবাদক) এ বিষয়টি যখন ইসলামের অংশ নয় তাহলে আমার উপর ওফাতে মসীহ-এর ঘোষণার কারণে কেন এত উগ্রতা প্রদর্শন করা হলো যে, এই ব্যক্তি কাফের এবং দাজ্জাল। তাদেরকে যেন মুসলমানদের কবর স্থানে দাফন না করা হয়, তাদের মাল লুণ্ঠন করা বৈধ, তাদের মহিলাদের নিকাহ ছাড়া ঘরে রাখা বৈধ এবং তাদের হত্যা করা পুণ্যের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। একতো সেই সময় ছিল যখন এই মৌলভীরা চিৎকার করতো যে কারো মধ্যে যদি ৯৯টি কুফরির কারণ থাকে আর একটি ইসলামের, তথাপিও কুফরির ফতোয়া দেওয়া উচিত নয়। তাকে মুসলমানই বল। কিন্তু এখন কি হয়ে গেছে? আমি কি এর থেকেও নীচে চলে গেছি? আমি এবং আমার জাতি কি 'আশ্‌হাদো আল্লা ইলাহ্‌ ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌' পড়ি না? আমি নি নামায পড়ি না? আমার শিষ্যরা কি নামায পড়ে না? আমরা কি রমযানের রোযা রাখি না? আমরা কি সেই সমস্ত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নই যা আঁ হযরত (সা.) ইসলাম বলে আখ্যা দিয়েছেন?

আমি যথার্থতার সঙ্গে খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। তারা আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীমের উপর সেভাবে ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের রাখা উচিত। আমি এক বিন্দু পরিমাণও ইসলামের বাইরে পা রাখাকে ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার ধর্ম এটিই যে, কোন ব্যক্তি যত বেশি কল্যাণ, বরকত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য পেতে চায় তা কেবল আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ এবং পূর্ণাঙ্গীন ভালবাসার মাধ্যমে পেতে পারে, নতুবা নয়। তিনি (সা.) ছাড়া পুণ্যের কোন রাস্তা নেই। তবে এটিও সত্য যে, আমি কখনও বিশ্বাস করি না যে, মসীহ (আ.) আকাশে গিয়াছেন আর এখনও পর্যন্ত জীবিত কায়েম আছেন। এই বিষয়টিকে মানলে আঁ হযরত (সা.)-এর বড়ই অপমান এবং অমর্যাদা হয়। এই দুর্নামকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারি না । সবাই জানেন আঁ হযরত (সা.) তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন এবং পবিত্র মদীনায় তাঁর সমাধি রয়েছে। প্রত্যেক বছর হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হাজীও সেখানে গিয়ে থাকেন । মসীহ (আ.) সম্পর্কে যদি মৃত্যু বিশ্বাস করা বা তাঁর দিকে মৃত্যুকে সম্পর্কযুক্ত করা অসম্মানের হয় তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে তাদের এই অবমাননা এবং বেয়াদবী কেন বিশ্বাস করা হয়? তোমরা তো অত্যন্ত

এরপর আটের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০ শে ফেব্রুয়ারীঃ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণে (শিশুদের উদ্দেশ্যে)

মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনচরিত

মূল - আমাতুল কুদ্দুস
অনুবাদ - মোরতোজা আলী, বড়িশা

(শেষ কিস্তি)

ইং ১৯২৪ সালের প্রারম্ভে ইংলন্ডের ওয়েম্বলে পার্কে একটি প্রদর্শনীর সাথে একটি ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) স্বয়ং গমন করেন। এই সম্মেলনে তার প্রবন্ধ 'আহমদীয়াত অর্থাৎ হকীকি ইসলাম' শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁন সাহেব পাঠ করেন যা অত্যন্ত সমাদৃত হয়।

ইং ডিসেম্বর, ১৯৩০ সালে তার জ্যেষ্ঠ ভাই হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তার হাতে 'বয়াত' গ্রহণ করেন এবং এইরূপে 'তিনি তিন কে চার করবেন' ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। আহমদীদের সাথে তার শুধু অন্তরঙ্গতা ছিল না পক্ষান্তরে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে অনেক বেশি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। অনেক বৎসর থেকে কাশ্মিরী মুসলমানদের উপর হিন্দুরা অত্যাচার করছিল। ইং

১৯৩১ সালে এই অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কাশ্মিরের হিন্দু শাসক সহস্র সহস্র মুসলমানদের শহীদ করে দেয়। তাদের সম্পত্তি লুঠ করে নেওয়া হয়। বহু মুসলমানকে বন্দি করা হয়। কাশ্মিরের মুসলমান অধিবাসীরা তার নিকট এই সমস্ত ঘটনা লেখেন এবং নিবেদন করেন আপনি কাশ্মিরের ব্যাপারটা নিজ হাতে গ্রহণ করুন। তিনি তৎক্ষনাত ভারতের ভাইসরয়কে তার বার্তা- যোগে কাশ্মিরের মুসলমানদের কষ্টকর অবস্থা দূরীকরণের কথা বলেন। তা ছাড়া তিনি মুসলমানদের সমস্ত বড় বড় নেতাদের শিমলায় একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে তিনি বলেন, কাশ্মিরের মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে চেষ্টা করা যাতে তারা তাদের অধিকার ফিরে পায়। অতএব 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মির কমিটি' গঠিত হল এবং খাজা হাসান নেযামী ও আল্লামা ইকবাল সভাপতি হওয়ার জন্য তার (মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)) এর নাম উত্থাপন করলেন। প্রথমতঃ তিনি অনেকবার প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাদের পুনঃ পুনঃ পিড়াপিড়িতে তিনি (রাঃ) সম্মত হলেন যেহেতু মুসলমানদের সেই সময়ে তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সেই যুগে মুসলমানদের বড় বড় নেতারা তার কাছে আসতেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করতেন। অবশেষে 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মির কমিটির' প্রচেষ্টায় কাশ্মিরের মহারাজা মুসলমানদের অধিকার প্রদান করার অঙ্গিকার করেন।

ইং ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ সালে হযরত আমীরুল মো'মিনিন (রাঃ) এর বিবাহ হযরত ডাক্তার মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ) এর কন্যা হযরত সৈয়্যেদা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবার সাথে সম্পন্ন হয়। সাহেবযাদি আমাতুল মতীন বেগম সাহেবা তার কন্যা।ইং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহ্মুদ আহমদ (রাঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী জামাত আহমদীয়া অনেক বড় বড় কাজও ত্যাগ স্বীকার করে।পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় যদিও কাশ্মিরের মুসলমানদের জন সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। হিন্দু মহারাজা ইংরেজদের সাথে যুক্ত হয়ে কাশ্মিরকে ভারতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিয়ে নিয়েছিল। কাশ্মিরের মুসলমানরা পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত হতে চেয়েছিল, কিন্তু মহারাজা এবং ভারত সরকারের সম্মুখে অসহায় ছিল।

পাকিস্তান সরকার এই মত প্রকাশ করল কাশ্মিরের স্বাধিনতা লাভ করার জন্য একটি স্বেচ্ছা সেবক দলের প্রয়োজন যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনিকে সাহায্য করবে। সুতরাং তিনি 'ফুরকান ব্যাটিলিয়ন' প্রতিষ্ঠা করলেন যা ইং১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আহ্মদী যুবকেরা এতে আবেগ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজ সেনাবাহিনীকে সহায়তা করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) স্বয়ং রণক্ষেত্রে আগমন করেন। যা দ্বারা আহ্মদী যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বৃদ্ধি পেল। আহমদীদের এই 'জেহাদ' সম্বন্ধে 'কায়েদ-এ-আযম' পত্রিকা ইং ১৯৪৯ লেখে যে, "জেহাদে কাশ্মিরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন কারীরা যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আহমদীয়া জামাতআন্তরিকতা ও ব্যথিত হৃদয়ের সঙ্গে অংশ গ্রহণ ও ত্যাগ স্বীকার করেছে আমাদের ধারণা মুসলমানদের মধ্যে কোন জামাতে আজ পর্যন্ত এরূপ সৎসাহস ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ দেখা যায় নি"।কিভাবে জামাত অধিক থেকে অধিকতর উন্নতি লাভ করতে পারে তার জন্য তিনি সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করতেন। এই পর্যায় ক্রমে তিনি ইং১৯৩৪ সালে "তাহরিক-এ-জদীদ" এর ভিত্তি স্থাপন করেন। "তাহরিক-এ-জদীদ" এর ১৯টি (উনিশটি) দাবী ছিল, যার মধ্য থেকে আমি এখানে কিছু লিখছি এই জন্য যে, তোমরাও জানতে পার। প্রথম দাবী এই ছিল যে, * প্রত্যেক আহমদী অঙ্গিকার করুক এক তরকারি ব্যবহার করবে। আবশ্যক হলে তবেই নতুন পোষাক তৈরী করাবে অন্যথায় বাজে খরচ করবে না। সিনেমা ইত্যাদি দেখবে না। * সকল আহমদীরা তিন বছরের জন্য নিজেদের টাকা-পয়সা 'বায়তুল মাল' এ জমা করান যা তিন বছর পর তাদের ফেরত দেওয়া হবে। * আহমদীরা তবলীগের জন্য নিজ খরচে বাহিরে যাবে। এই জন্য অস্থায়ীভাবে নিজেকে 'ওয়াকফ' (উৎসর্গ) করুন । যাদের পেনশন চালু হয়ে গেছে তারাও দ্বীনের (ধর্মের) সেবার জন্য নিজেদের উপস্থাপন করুন। এইরূপে ডাক্তার, উকিল ইত্যাদিরা জামাতের জন্য নিজেদের 'ওয়াকফ' করুন।* আহমদী ছেলেরা বিভিন্ন রকমের শিক্ষা লাভ করুক। কেউ ডাক্তার হোক, কেউ উকিল, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ রেলওয়েতে যাক, কেউ সেনা বাহিনিতে মোট কথা আহমদীরা সব রকম পেশা অবলম্বন করুক। * নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস, কোনও আহমদী বেকার না থাকা, মজদুরী করা, পত্র-পত্রিকা বা বইপুস্তক বিক্রি করা, কিছু করুক কিন্তু বেকার হয়ে বসে না থাকে। যদি স্বদেশে কাজ না পাওয়া যায় তাহলে বিদেশে চলে যাক। যারা অক্ষম চলতে ফিরতে পারে না, কিছুই কাজ করতে পারে না, তারা বসে বসে দোয়া করতে থাকুন।

আহমদীরা তাহরিক জদীদের দাবীগুলি অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে পূর্ণ করেছেন। এই দাবীগুলি প্রথমতঃ তিন বছরের জন্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু দাবী স্থায়ী করে দেওয়া হয়।হযরত আমীরুল মো'মিনীন খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) স্বয়ং তাহরিক জদীদের প্রতি কঠোর ভাবে কর্ম-সম্পাদন করেন। সূচনাতেই এত কাজ হত তিনি (রাঃ) রাত একটার পূর্ব্বে কখনও নিদ্রাগমন করেননি। কখনও কখনও ভোর তিনটে-চারটে সকাল পর্যন্ত কাজ করতেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাহরিক জদীদের ফান্ডে এক লাখ আঠার হাজার ছয়শত ছিয়াশি টাকা চাঁদা দেন, এ ছাড়া তিনি নিজের মূল্যবান জমি দান করেন।

শিশুগণ! একটা ঘটনা শোনো। একবার তিনি খেতে এলেন, কিন্তু খাবার দেখে চুপচাপ উঠে গেলেন। পরে তিনি বলেন, আমার টেবিলে যেন এক তরকারী থাকে। কিন্তু আজ তিন রকম খাবার ছিল, এইজন্য খাবার খাবনা। তিনি চার বৎসর যাবৎ নিজের পোষাক পরিচ্ছদের জন্য কাপড় ক্রয় করেননি। এবং 'তাহরিক জদীদ' এর পূর্ব্বে বানানো জামা-কাপড় সংযত ভাবে ব্যবহার করতেন। প্রথম প্রথম গরমের দিনে বরফও ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি ব্যবহার করা ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তার সকল পুত্রদের 'ওয়াকফ' করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমার তেরোজন (১৩)পুত্র আর তেরো জনই ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত (ওয়াকফ)"। তিনি স্বয়ং 'ওয়াকারে আমল' এ অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন, "যখন প্রথম দিন আমি কোদাল ধরলাম ও মাটির ঝুড়ি উঠালাম তখন কিছু ভক্তরা কাঁপ ছিল এবং দৌড়ে দৌড়ে এসে বলত হুযুর, কষ্ট করবেন না আমরা কাজ করছি। কিন্তু যখন কয়েকদিন আমি তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলাম তখন তারা অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং বুঝে গেল যে এটা একটা যৌথ কাজ যা এরাও করছে এবং আমরাও করছি"।তাঁর সর্বদা এই প্রচেষ্টা ছিল যেন কোন আহমদী অকর্মণ্য হয়ে বসে না থাকে। সুতরাং আহমদী যুবকদের মধ্যে শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তিনি শিল্প ভবন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর উদ্বোধনের প্রাক্কালে নিজ হাতে রেঁদা নিয়ে কাঠ পরিষ্কার করেন ও করাত দিয়ে কাঠ কেটে নিজ কর্মের দ্বারা কার্য্যতঃ বুঝিয়ে দেন, নিজ হাতে কাজ করা লজ্জাকর নয় বরং সম্মানজনক তিনি পৃথিবীর অনেক দেশে মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে আহমদীয়াতের মোবাল্লিগ লোকদের কে ইসলামের শিক্ষা দেয়। এইভাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে লোকেরা তার নামের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। এবং এইভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় যে, "সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে এবং জাতিরা তার থেকে আশিস প্রাপ্ত হবে"।

হযরত ফয্লে ওমর (রাঃ) যে সমস্ত 'তাহ্রিক' এর ভিত্তি স্থাপন করেন তার মধ্যে একটি অতীব মাহাত্মপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ তাহরিক মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করা। এই সংগঠন ইং ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা যুবকদের সংগঠন এবং এই জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে সর্বকালে আহমদীয়া জামাতের যুবকদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে হতে থাকে যেন ইসলামের পতাকা উঁচু থাকে। পরবর্ত্তীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে জামাতের বাচ্চাদের জন্য আতফালুল আহমদীয়া সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় যাতে শিশুকাল থেকে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ইসলাম অনুযায়ী করা যেতে পারে।

এরপর সাত ও আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

আজ বাংলাদেশের জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বাংলাদেশ জামা'তও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একটি জামা'ত। এটিও সেই দেশ, যে দেশের আহমদীরা প্রাণের কুরবানী দিয়েছে। অনুরূপভাবে সিয়েরালিওনেও আজ জালসা সালানা আরম্ভ হয়েছে।

সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যে উদ্দেশ্যে জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেই উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং তা অর্জনও করতে পারি।

পৃথিবীর সকল আহমদীর উচিত, সর্বদা এ উদ্দেশ্যকে তাদের দৃষ্টিপটে রাখা। কেননা, জলসার এ সব উদ্দেশ্য কেবল তিন দিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং এক আহমদী মুসলমানের সারা জীবনের উদ্দেশ্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশের আলোকে জলসা সালানার কতিপয় উদ্দেশ্যাবলীর উল্লেক এবং এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

আজ যখন ইসলামকে সর্বত্র দুর্নাম করা হচ্ছে। স্বয়ং মুসলমান দেশগুলোতেই মুসলমান মুসলমানেররক্তপিপাসু শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের আমল বা ব্যবহারিক আচরণ ইসলামী শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে চলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদেরকেই জগদ্বাসীকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। এ জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনএবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে দোয়া করা। নিজেদের কাজের বরকত ও কল্যাণের জন্যও আল্লাহ্ তা'লার কাছেই হাত পাততে হবে। আর নিজেদের ব্যবহারিক উন্নত নৈতিক চরিত্রিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে হবে, যেন জগদ্বাসী দেখতে পায় যে, যদি ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ইবাদতের উচ্চমান দেখতে হয়, তবে তা আহমদীদের মাঝে দেখ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ৩ রা ফেব্রুয়ারী , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৩ তবলীগ, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ বাংলাদেশের জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। এবার তাদের জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে আমার বক্তব্য ছিল না। কাজেই, তারা এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে যে, খুতবাতেই যেন এ প্রেক্ষাপটে কিছু বলি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বাংলাদেশ জামা'তও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একটি জামা'ত। এটিও সেই দেশ, যে দেশের আহমদীরা প্রাণের কুরবানী দিয়েছে, প্রায় ১২/১৩ জন শহীদ হয়েছে। কঠোরতা সহ্য করেছে এবং করছে। কিন্তু আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক দৃঢ়তার অধিকারী। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমান ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। অনুরূপভাবে সিয়েরালিওনেও আজ জালসা সালানা আরম্ভ হয়েছে। সেখানেও আবহওয়ার কারণে তাদের দুঃচিন্তা ছিল এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কাও ছিল। তারা দোয়ার অনুরোধ করেছে এবং জলসা যেন সকল অর্থেবরকতমন্ডিত হয়, সে জন্যও তারা দোয়ার অনুরোধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও কল্যাণমন্ডিত করুন।

সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যে উদ্দেশ্যে জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেই উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং তা অর্জনও করতে পারি। সে জলসা পৃথিবীর যে দেশেই অনুষ্ঠিত হোক না, বাংলাদেশে হোক বা সিয়েরালিওন বা আফ্রিকা অথবা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই হোক না কেন। জলসার সে উদ্দেশ্য কী? সে উদ্দেশ্য তা-ই, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় জলসার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন। আমি আশা করি, জলসার উদ্বোধনের সময় বাংলাদেশ এবং সিয়েরালিওনের জামা'ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই উদ্ধৃতিগুলো শুনে থাকবে। পৃথিবীর সকল আহমদীর উচিত, সর্বদা এ উদ্দেশ্যকে তাদের দৃষ্টিপটে রাখা। কেননা, জলসার এ সব উদ্দেশ্য কেবল তিন দিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং এক আহমদী মুসলমানের সারা জীবনের উদ্দেশ্য। তাই এ সব উদ্দেশ্যকে আমাদের সামনে রাখা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, জলসার একটিউদ্দেশ্য হল, তাকওয়া এবং খোদাভীতি সৃষ্টি হওয়া। এটি অস্থায়ী কোন বিষয় নয়, বরং স্থায়ীভাবে চর্চায় রাখার মত বিষয়। জলসায় আগমন তোমার মাঝে যেন আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতির সত্যিকার চেতনা সৃষ্টি করে। এটিও একটি স্থায়ী বিষয়। অর্থাৎ এমন ভীতি, যা শুধু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভীত হওয়ার মত ভয় নয়, বরং প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টির ভীতি হৃদয়ে বিরাজ করা উচিত। আরেকটি উদ্দেশ্য হল, জলসায় আগমন এবংআধ্যাত্মিক পরিবেশ যেন পরস্পরের জন্য হৃদয়ের কোমলতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের যেন প্রতিযোগিতা হয়। নিজেদের মাঝে যেন এমন ভ্রাতৃত্ব বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেখে বিশ্ববাসীও ঈর্ষা বোধ করে। এমন দৃষ্টান্তই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার পরিচায়ক।

হুযূর (আ.) এ বিষয়ের আবশ্যকতার চেতনাও জাগ্রত করেছেন, তাঁর অনুসারীরা যেন বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে এবং অহংকার ও আত্মম্ভরিতা মন থেকে ধুয়ে মুছে ঝেড়ে ফেলে। (শাহাদাতুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪,৩৯৮) আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হয়ে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য্য যেন নিজ নিজ দেশে প্রচার ও প্রসার করে। বিরোধিতা যদি থেকে থাকে, তা আমাদের কাজ বন্ধ করতে পারবে না। প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য।

আজ যখন ইসলামকে সর্বত্র দুর্নাম করা হচ্ছে। স্বয়ং মুসলমান দেশগুলোতেই মুসলমান মুসলমানেররক্তপিপাসু শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের আমল বা ব্যবহারিক আচরণ ইসলামী শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে চলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদেরকেই জগদ্বাসীকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। এ জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনএবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে দোয়া করা। নিজেদের কাজের বরকত ও কল্যাণের জন্যও আল্লাহ্ তা'লার কাছেই হাত পাততে হবে। আর নিজেদের ব্যবহারিক উন্নত নৈতিক চরিত্রিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে হবে, যেন জগদ্বাসী দেখতে পায় যে, যদি ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ইবাদতের উচ্চমান দেখতে হয়, তবে তা আহমদীদের মাঝে দেখ।

ইসলামী শিক্ষা অনুসারে যদি বান্দার অধিকার প্রদান এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সুমহান দৃষ্টান্ত দেখতে হয়,তবে তা আহমদীদের মাঝে দেখ। অতএব, এ জলসা কেবল তিন দিনের জন্য আহমদীদের একত্রিত করে কিছু ধর্মীয় কথা শোনানোর জন্যই নয়, শুধু এ জন্য জলসার আয়োজন করা হয় না বরং এ জন্য আয়োজন করা হয়, যেন এ পরিবেশে, অর্থাৎ তিন দিনে জলসার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে অবস্থান করে মানুষ যেন তাদের হৃদয়ের মরিচা ঝেড়ে ফেলতে পারে। বিশ্বাসগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে এখানকার আহমদীরা খুবই দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী। যেভাবে আমি বলেছি, এর জন্য বাংলাদেশের

আহমদীরা প্রাণও বলি দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সবার কাছে এটিই চান যে, ইসলামের এই পুনর্জীবনের যুগে সবাই যেন তাদের উন্নত ব্যবহারিক আচরণ প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা'লা বর্ণিত রীতি অনুসারে নিয়মিত নামায পড়ুন, নিজেদের নামাযে এর প্রকৃত ভাব-গম্ভীর্য্য সৃষ্টির চেষ্টাকরুন। এ সম্পর্কে গত দুই খুতবায় আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বান্দাদের প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের সকল শক্তি-সামর্থকে নিয়োজিত করে দায়িত্ব পালন করুন।

যেভাবে জলসার উদ্দেশ্যাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি উদ্দেশ্য হল- তাকওয়া এবং খোদাভীতি সৃষ্টি করা। তাকওয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"তাকওয়ার অর্থ হল, পাপের সূক্ষ্ম রাস্তাগুলো বর্জন করা, পাপের সূক্ষ্ম রাস্তাগুলো বর্জন করা। স্মরণ রেখো! পুণ্য শুধু এটিই নয় যে, কোন এক ব্যক্তি বলে, আমি নেক। কেননা, আমি কারো সম্পদ হরণ করি নি, কারো সম্পদ লুটপাট করি নি, কারো অধিকার হরণ করি নি, সিঁধ কেটে চুরি করি নি, কুদৃষ্টি দিই না এবং ব্যভিচারও করি না। এমন নেকী তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে হাস্যকর বিষয়, এগুলো পুণ্য নয় বরং রসিকতা। কেননা, সে যদি এ সব পাপে লিপ্ত হয়, চুরি ও ডাকাতি করে, তবে সে শাস্তি পাবে। অতএব, এটি কোন পুণ্য নয়, যা তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মূল্যায়নের যোগ্য হতে পারে। বরং সত্যিকার এবং প্রকৃত নেকী হল, মানব জাতির সেবা করা। আর খোদার পথে পূর্ণ নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা, তাঁর পথে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা না করা। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযিনাত্তাকাউ ওয়াল্লাযিনা হুম মুহসেনুন'। (সূরা নাহল: ১২৯) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে আছেন, যারা পাপ এড়িয়ে চলে। আর একই সাথে পুণ্যকর্মও করে। হুযূর (আ.) বলেছেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো, নিছক পাপ বর্জন করা বড় কোন বিষয় নয়, যতক্ষণ একই সাথে নেককর্ম না করবে। অনেকেই এমন হবে যারা কখনো ব্যভিচার বা যেনা করে নি, হত্যা করে নি, চুরি করে নি, ডাকাতি করে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লার পথে তারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নি। অপরাধ তো করে নি, কিন্তু বিশ্বস্ত তার এমন কোন দৃষ্টান্তও স্থাপন করে নি, যা প্রশংসনীয় হতে পারে অথবা মানব জাতির কোন সেবাও করে নি। আর এ ধরনের কোন পুণ্যকর্ম করে নি। অতএব, অজ্ঞ সে ব্যক্তি, যে এসব কথা উপস্থাপন করে তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা এগুলো তো পাপাচারিতা। এতটুকু ভাবলেই মানুষ ওলী-আউলিয়াদের অন্তর্ভু ক্ত হয় না। তিনি বলেন, পাপাচারি, চোর, বিশ্বাসঘাতক এবং ঘুষখোরের জন্য খোদা তা'লার রীতি হল, তাকে এই পৃথিবীতেই শাস্তি দেয়া হয়, এরা ইহজগতেই শাস্তি পায়। তারা ততক্ষণ মরে না, যতক্ষণ শাস্তি না পায়। কোন না কোনভাবে তারা শাস্তি পেয়ে যায়। স্মরণ রেখো! নেকী বা পুণ্য কেবল এতটুকুই নয়।"

তিনি বলেন, "তাকওয়ার সর্বনিম্ন স্তরের দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায় যে, যেভাবে কোন প্লেটকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়, যেন তাতে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা যায়। এখন যদি কোন প্লেট খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে রেখে দেয়া হয়, কিন্তু তাতে খাবার রাখা না হয়, তাহলে এতে কি পেট ভরতে পারে? মোটেই নয়। সেই খালি প্লেট কি ক্ষুধা নিবারণ করবে? অর্থাৎ খালি প্লেট সামনে রাখলে কি ক্ষুধা নিবারণ হবে, খাবার না খেয়ে? মোটেই নয়। একইভাবে তাকওয়ার বিষয়ও বোঝার চেষ্টা কর। তাকওয়া কী? তিনি প্রশ্ন করছেন, তাকওয়া কী? তাকওয়া হল অবাধ্য প্রবৃত্তির প্লেটকে পরিষ্কার করা। অবাধ্য প্রবৃত্তি হল সেই জিনিস, যা মানুষকে সর্বদা পাপে প্রবৃত্ত করে, পাপ করে সে লজ্জা পায় না। এ জন্য তাকওয়া হল, অবাধ্য প্রবৃত্তির প্লেটকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা। আর নেকী বা পুণ্য সেই খাদ্য, যখন এটি পরিষ্কার হয়, পাপ থেকে বেঁচে চলে, এটি তাকওয়ার ন্যূনতম স্তর। এরপর সেই প্লেটে খাবার পরিবেশন কর। আর সেই খাবার হল সেই পুণ্য, যা আল্লাহ্ তা'লা করতে বলেছেন। আর এর মাঝে রয়েছে, খোদার প্রাপ্য অধিকার এবং বান্দাদের প্রাপ্যও। তিনি বলেন, নেকী সেই খাবার, যা তাতে রাখা হয় আর যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তি যুগিয়ে মানুষকে নেক কাজের যোগ্য করে। কেউ যদি নেক কর্ম করে, সৎকর্ম করার চেষ্টা করে, যত মানবীয় শক্তি-বৃত্তি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, সেগুলোকে এ জন্য দৃঢ় করে যেন এর দ্বারা খোদার অধিকার প্রদান করা হয় এবং তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে যেন নেককর্ম সাধিত হয় আর তারা যেন খোদার নৈকট্যের মহান মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই উভয় বিষয় যদি ঘটে, নেকী যদি হওয়া আরম্ভ হয়, তাহলে তাকওয়ার মানও উন্নীত হবে আর খোদার নৈকট্যও লাভ হবে।

পুনরায় একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত। দোয়া কী? ইবাদত কাকে বলে? ইবাদত এবং দোয়ার ফলে কী কী নিদর্শনাবলী প্র কাশ পায় আর দোয়া ও ইবাদত কীভাবে করা উচিত? কেমন হওয়া উচিত এবং দোয়ার প্রকৃত মর্ম বা তত্ত্ব বোঝার জন্য কী রীতি অবলম্বন করা উচিত? আর এর মাধ্যমে কীভাবে খোদার নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব? আর এ ক্ষেত্রে নামাযের ভূমিকা কী? এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"দোয়া সেই মহৌষধ,যা মাটির এক ঢেলাকে মূল্যবান স্বর্ণে পরিণত করে। এক মুষ্ঠি মাটি দোয়ার ফলে স্বর্ণ হয়ে যায়। দোয়াতে এমন প্রভাব বিস্তারী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। দোয়া সেই পানি, যা অভ্যন্তরীণ নোংরামিকে বিধৌত করে। কেমন দোয়া? তিনি বলেন, সেই দোয়ার ফলে হৃদয় বিগলিত হয়, এমন দোয়া, যা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয় এবং এর ফলে হৃদয় বিগলিত হয় আর পানির মত প্রবাহিত হয়ে খোদা তা'লার দরবারে তা নিবেদিত হয়। খোদার দরবারে সে দন্ডায়মানও হয়, রুকুও করে, আবার সেজদাও করে। আর এরই প্রতিচ্ছবি হল সেই নামায, যা ইসলাম শিখিয়েছে। অর্থাৎ দোয়া যখন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, সে কখনো ব্যকুলতার সাথে দন্ডায়মান হয়, কখনো রুকু করে, আবার কখনো সেজদা করে। আত্মার বিভিন্ন রূপ রয়েছে আর এর বাহ্যিক রূপ হল নামায, যা নামাযে দেখা যায়, যা ইসলাম শিখিয়েছে। আর আত্মার দন্ডায়মান হওয়া হল, সে খোদার জন্য সকল ভীতিকে সহ্য করা এবং নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখায়। তার রুকু বা তার আত্মার ঝুঁকা বা রুকু করার অর্থ হল, সমস্ত প্রেম-প্রীতি ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র সামনে ঝুঁকে, আল্লাহ্র চেয়ে বড় কোন সম্পর্ক নেই আর সে আল্লাহ্র হয়ে যায়। আর তার এর সেজদা হল,আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়। নিজ সত্তার ছাপ সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দেয়। নিজের কিছুই রাখে না। সব আল্লাহ্র হয়ে যায়। তিনি বলেন, এই নামাযই খোদার সাথে মিলিত করে। নামাযের প্রকৃত অর্থ যদি উদঘাটন করতে হয় যে, নামায কী? তাহলে এটি হল সেই নামায, যার ফলে খোদা লাভ হয়। মানুষ বলে যে, অনেক নামায পড়েছি কিন্তু খোদাকে পেলাম না। অতএব, এ অবস্থ া সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত, এর প্রতিচ্ছবি দৈনন্দিন নাম াযে অঙ্কন করে দেখিয়েছে, যেন সেই দৈহিক নামায আধ্যাত্মিক নামাযের কারণ হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা মানব সত্তার গঠন ও গড়নে সৃষ্টি করেছেন যে, আত্মার প্রভাব দেহের উপর আর দেহের প্রভাব আত্মার উপর পড়ে। তোমাদের আত্মা যখন দুঃখভারাক্রান্ত হয়, চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আর আত্মা যখন আনন্দিত হয়, চেহারায় হাস্যোৎফুল্লতা ফুটে উঠে। এমনকি অনেক সময় মানুষ হাসতে আরম্ভ করে। একইভাবে শরীরে কোন আঘাত লাগলে সেই ব্যথায় আত্মাও অংশীদার হয়। শরীর যখন শীতল বাতাসে প্র শান্ত হয়, আত্মাও তা থেকে অংশ পায়। অতএব, দৈহিক ইবাদতের উদ্দেশ্য হল, আত্মা এবং দেহের পারস্পরিক সম্পর্কের সুবাদে আত্মায় যেন মহাসম্মানিত খোদার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এক গতির সঞ্চার হয়। আর আধ্যাত্মিক কিয়াম এবং সেজদায় যেন রত হয়। কেননা বাহ্যিক কিয়াম, সেজদা ও রুকুতে মানুষের এমন এক পর্যায়ে উপনীত হওয়া উচিত, যা হবে আধ্যাত্মিক। আত্মা যেন রুকু করে, আত্মা যেন সেজদা করে অথবা সেজদা ও রুকু যেন আত্মা থেকে হয়। আর সেই অবস্থা যেন সৃষ্টি হয়, যা বাহ্যিক দুঃখ এবং আনন্দের সময় মানুষের সৃষ্টি হয়।মানুষ কাঁদেও আবার হাসেও। একইভাবে খোদার সাথে সম্পর্কে র ক্ষেত্রেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত, আধ্যাত্মিক কিয়াম এবং সেজদায় রত হওয়া উচিত। কেননা, মানুষ উন্নতি করার জন্য সংগ্রাম এবং চেষ্টাসাধনার মুখাপেক্ষী। উন্নতি করতে হলে চেষ্টা-সাধনা করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয় আর এটিও এক ধরণের সংগ্রাম। জানা কথা যে, দু'টো জিনিস একটি অন্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে যখন এগুলোর একটিকে উঠানো হবে, তখন একটি উঠানোর ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয়টি যা এর সাথে সংযুক্ত তাতেও কিছু গতি সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাতে কেবল দৈহিক কিয়াম, রুকু এবং সিজদার কোন লাভ নেই, যদি কেবল বাহ্যিক অর্থে রুকু, সেজদা এবং কেয়াম মানুষ নামাযে করে। এর ফলে কোন লাভ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে এই চেষ্টা না থাকবে যে, আত্মাও যেন নিজ জায়গায় কেয়াম, রুকু এবং সিজদা থেকে কিছু টা অংশ পায় আর এ অংশ

পাওয়া তত্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং তত্বজ্ঞান নির্ভর করে কৃপার উপর।"

(লেকচার সিয়ালকোট,রূহানী খাযায়েন, ২০ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৩-২২৪)

অতএব, তিনি এক জায়গায় ব্যাখ্যা করছেন বলেছেন, খোদার কৃপাতেই সব কিছু লাভ হয়। তাই, কৃপাধন্য হওয়ার জন্যও আল্লাহ তা'লার সামনে সেজদাবনত হও, তাঁর কাছে হাত পাত। আর খোদার কৃপায়যদি এই তত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তবেই প্রকৃত অর্থে নামায হয়। আর এর জন্য সংগ্রাম, চেষ্টা-সাধনা এবং অবিরাম পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। চেষ্টা-সাধনা যদি থাকে তবে মানুষের জন্মের উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। তাকওয়া এবং প্র কৃত ইবাদত তখনই উৎকর্ষ লাভ করে। যেভাবে পূর্বেও একটি উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'টি জিনিস রয়েছে, একটি খোদার অধিকার, অন্যটি বান্দাদের প্রাপ্য। আর এই তাকওয়াও তখনই পূর্ণতা পাবে এবং সত্যিকার ইবাদতও তখনই পরম মার্গে পৌঁছবে, যখন বান্দার অধিকারও একই সাথে প্রদান করা হবে। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আসল কথা হল, সবচেয়ে কঠিন এবং স্পর্শকাতর বিষয় হল, বান্দাদের অধিকার প্রদান করা। মানুষ নামাযও পড়ে, মসজিদেও আসে, চাঁদাও দেয়, অনেক সময় প্রাণও বিসর্জন দেয় কিন্তু কখনো এমন মুহূর্তও আসে, যখন মানুষের অধিকার প্রদান করা কঠিন হয়ে যায়। তিনি বলেন, সবচেয়ে স্পর্শ কাতর এবং কঠিন বিষয় হল, বান্দার অধিকার প্রদান করা।কেননা, সে সব সময় এ বিষয়ের সম্মুখীন হয় আর সর্বদা সে এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। অতএব, এক্ষেত্রে খবই বুদ্ধিমত্তার সাথে পদচারণা করা উচিত। তিনি বলেন, আমার রীতি হল, শত্রুর সাথেও সীমাতিরিক্ত কঠোর আচরণ প্রদর্শন করা উচিত নয়। অনেকেই শত্রুকে ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করে। অন্যকে ধ্বংস করার জন্য যেন চেষ্টা করা হয়। সে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বৈধ-অবৈধের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে, তার গীবত করে আর অন্যদেরকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এখন বল! সামান্য শত্রুতা কত ভয়াবহ পাপে পর্যবসিত হচ্ছে। আর এ সব পাপ যখন বংশ বিস্তার করবে, এক পাপ থেকে দ্বিতীয় পাপের জন্ম হয়, এভাবে পাপের বংশ বিস্তার হয়। এই পাপের যখন বংশ বিস্তার ঘটবে, তখন কোথাকার পানি কোথায় দাঁড়াবে?"

তিনি বলেন, "আমি সত্য সত্যই বলছি, ব্যক্তিগত কারণে কাউকে শত্রু মনে করবে না, এই হিংসা-বিদ্বেষের অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর। যদি খোদা তোমাদের সাথে থাকেন আর তোমরা খোদার হয়ে যাও, তাহলে তিনি শত্রুদেরও তোমার সেবকের অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। কিন্তু খোদার সাথে যদি তোমার সম্পর্ক ছিন্ন থাকে আর তাঁর সাথে যদি কোন বন্ধুত্বের সম্পর্কই না থাকে, তোমাদের আচার-আচরণ যদি তাঁর ইচ্ছা বিরোধী হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তোমাদের আচার-আচরণ যদি তার ইচ্ছার পরিপন্থি হয়, তাহলে তোমাদের জন্য খোদার চেয়ে বড় শত্রু আর কে হবে? সৃষ্টির শত্রুতা মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে কিন্তু খোদা যদি শত্রু হয়ে যান আর পুরো সৃষ্টিও যদি বন্ধু হয়ে যায়, তবুও কিছু হতে পারে না। তাই তোমাদের রীতি-নীতি নবীদের রীতি-নীতি সদৃশ হওয়া উচিত। এটিই আল্লাহ্র ইচ্ছা যে, ব্যক্তিগত শত্রুতা যেন অন্যের প্রতি না থাকে। "

তিনি বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মানুষ তখনই সম্মান এবং সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী হয়, যখন সে কারো ব্যক্তিগত শত্রু না হয়। হ্যাঁ, আল্লাহ্ এবং রসূলের সম্মানের জন্য যদি হয়, তাহলে ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ এবং রসূলের সম্মানের প্রশ্ন আসলে সেখানে যদি শত্রুতা সৃষ্টি হয়,অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং রসূলের সম্মান করে না, বরং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাকে তোমরা নিজেদের শত্রু জ্ঞান করবে। তাকে শত্রু মনে করার অর্থ এটি নয় যে, (এখানেও তিনি ব্যাখ্যা করছেন যে,) শত্রু মনে করার অর্থ এটি নয় যে, তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে আর বিনা কারণে তাকে কষ্ট দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। না, বরং তার থেকে পৃথক হয়ে যাও। আর এ বিষয়টিকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ কর। সম্ভব হলে তার সংশোধনের জন্য দোয়া কর। যদি সম্ভব হয়, শত্রুর সংশোধনের জন্য দোয়া কর, নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোন ঝগড়া তার সাথে আরম্ভ করবে না।

তিনি বলেন, "এই বিষয়গুলোই আত্মশুদ্ধির সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত আলীর সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বলা হয়- হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু এক শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলেন, শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধরত ছিলেন। অবশেষে হযরত আলী (রা.) তাকে ধরাশায়ী করেন এবং তার বুকের উপর উঠে বসেন, সেই ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আলীর মুখে থুথু মারে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তার বুক থেকে নেমে যান আর তাকে ছেড়ে দেন। এ জন্য যে, এতক্ষণ আমি তোমার সাথে শুধু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই যুদ্ধ করছিলাম, কিন্তু তুমি যখন আমার মুখে থুথু ফেলেছ, তখন এর ফলে আমার প্রবৃত্তির কিছু অংশও এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তাই আমি নিজের খাতিরে তোমাকে হত্যা করতে চাই না। এটি থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি নিজের শত্রুকে শত্রু মনে করেন নি। তিনি বলেন, এমন প্রকৃতি আর এমন অভ্যাস নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত। নিজের মান্যকারীদেরকে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন। যদি ব্যক্তিগত লোভ-লালসা এবং স্বার্থে র খাতিরে কাউকে দুঃখ দাও আর শত্রুতার গন্ডিকে প্রসারিত কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লাকে অসুন্তষ্ট করার মত কথা আর কী হবে?"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৫)

তাই ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে কাউকে দু:খ এবং কষ্ট দিবে না। আর আল্লাহ এবং রসূলের শত্রুদেরকে শত্রু জ্ঞান করে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর, তার জন্য দোয়া কর, তাদের সংশোধনের জন্য চেষ্টা কর। আর তাদের আক্রমণের বৈধভাবে উত্তর দাও। কিন্তু এমন নয় যে, তাদের প্রতিটি কথাকে নোংরা মনে করে অন্যায়ভাবে তাদের সাথে শত্রুতাপোষণ করবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তাকওয়ার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম বুঝার তৌফিক দিন। আর স্বীয় কৃপা বর্ষণ করে আমাদের নামায এবং ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানকরী বানিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বান্দার অধিকার প্রদানের সূক্ষ্ম দিকগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। আমাদের প্রতিটি কাজ জাগতিক হলেও তা যেন সর্বাবস্থায় খোদার সন্তুষ্টি অর্জন এবং এটিকে অগ্রগণ্য রাখার মানসে হয়। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

শিক্ষিকা চায়

নাযারত তালীম সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার অধীনে কাদিয়ানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খিদমতে ইচ্ছুক মহিলাদের অবগতির জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে-

(১) প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরের অধিক এবং ৩৭ বছরের কম হওয়া আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যত নুন্যতম উচ্চমাধ্যমিক এবং সামগ্রিকভাবে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশের কম নম্বর থাকে তবে এর থেকে উচ্চতর শিক্ষা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা আবশ্যক। (২) উচ্চমাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত সেমিস্টারে এবং প্রত্যেক বছরের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট এবং এছাড়াও টিচার ট্রেনিং ও অন্যান্য সার্টিফিকেটের এটেস্টেড কপি আবেদন পত্রের সঙ্গে নাযারত দিওয়ানে প্রেরণ করুন। (৩) লিখিত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ ছাত্রীদেরই ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাকা হবে। কেবল সেই সকল প্রত্যাশীদেরকেই শিক্ষিকা হিসেবে নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে যারা কেন্দ্রীয় কর্মী ভর্তি কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হবে। (৪) প্রত্যাশীর ইংরেজি উচ্চ মানের হওয়া আবশ্যিক। (৫) সাপ্তাহিক বদরে ঘোষণার দুই মাস পরে পরীক্ষার দিনক্ষণ সম্পর্কে জানানো হবে। (৬) লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এ পাস করার পর প্রত্যাশীকে নুর হাসপাতালে মেডিকেল চেক-আপ করানো আবশ্যক। এই চেক-আপ -এ সফলভাবে উত্তীর্ণ প্রত্যাশীরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। (৭) যদি কোন প্রত্যাশীর নির্বাচন হয় তবে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। (৯) নির্দিষ্ট আবেদন পত্র নাযারাত দিওয়ান থেকে সংগ্রহ করুন। আবেদন পত্র পুরণ হয়ে আসার পরে এবিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। (নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

মোবা: ০৯৮১৫৪৩৩৭৬০

অফিস: ০১৮৭২-৫০১১৩০

Email: nazaratdiwanqdn@gmail.com

শিশুদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ সান (রা.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

" রসূলুল্লাহ (সা.) শৈশব থেকেই শিশুদেরকে শিষ্টাচার শেখানোর আদেশ দিয়েছেন এবং প্রিয়জনদেরকেও শৈশবে শিষ্টাচার শিখিয়ে বাস্তব নমুনার প্রমাণ দিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, ইমাম হাসান যখন ছোট ছিলেন, তখন একবার খাওয়ার সময় মহানবী (সা.) বললেন, ডান হাত দিয়ে খাও এবং সামনে থেকে খাও। (বুখারী, কিতাবুল আতইমা) হযরত হাসান (রা.)-এর বয়স তখন প্রায় আড়াই বছর ছিল। আমাদের দেশে বাচ্চা যদি খাওয়ার বাসনে হাত দেয় এবং খাবারে পুরো মুখ ভরে ফেলে। আশেপাশের লোকদের কাপড়-চোপড় নোংরা ফেলে, তবে মা-বাপ পাশে বসে হাসতে থাকে, বিষয়টির উপর কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। অথবা এমনি কোন সাধারণ বিষয় বলে এড়িয়ে যায়। যার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে লোকদেরকে দেখানো বাচ্চাকে বোঝানো নয়। হাদিসে আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, শৈশবে হযরত হাসান (রা.) একবার সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর মুখে দিয়ে দেয়। রসুলুল্লাহ্ (সা.) তার মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে সেই খেজুর বার করে নিয়েছিলেন। (বুখারী, কিতাবুয যাকাত) যার অর্থ এই ছিল যে, তুমি নিজে কাজ করে খাবে, অপরের জন্য বোঝা হবে না।

মোট কথা শৈশব থেকেই তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে যা মানুষের ভবিষ্যত গড়ে তোলে।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, শিশু নিজের সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম নেয়। পরবর্তীতে তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা নক্ষত্র-পূজারীতে পরিণত করে। (বুখারী কিতাবুল ক্বদর) অনুরূপভাবে একথাও সত্য যে, মাতা-পিতাই তাকে মুসলমান বা হিন্দু বানায়। এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যখন বাচ্চা যৌবনে উপনীত হয় তখন মাতা-পিতা তাকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে খৃষ্টানে পরিণত করে বরং এর অর্থ হল এই যে, শিশুরা পিতা-মাতার কর্মপদ্ধতির অনুকরণ করে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে পিতা-মাতার ন্যায় হয়ে যায়। বস্তুতঃ শিশুদের মধ্যে অনুকরন করার অভ্যাস থাকে। যদি পিতা-মাতা তাকে ভাল কথা না শেখায় অন্যদের কর্মপদ্ধতির অনুকরণ করবে। অনেকে বলে থাকে যে, বাচ্চাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া উচিত, বড় হয়ে তারা নিজেরাই আহমদী হয়ে যাবে। আমি বলি যে, যদি শিশুর কানে অন্য কারোর কথা না ঢোকে তবে বড় হয়ে আহমদীয়াত সম্পর্কে কথাবার্ত শুনে তার আহমদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যদি অন্য কারোর কথা কানে পড়ে এবং সে সেগুলি শিখতে থাকে তবে সেই যা কিছু দেখবে বা শুনবে সে সেটাই হবে। যদি ফিরিস্তরা তাকে কিছু না শেখায় তবে শয়তান তাকে নিজের সঙ্গী করবে। যদি তার কানে সৎ কথাবার্তা না পড়ে বরং অসৎ কথা বার্তা পড়ে তবে অসৎ হয়ে যাবে।

তরবীয়তের পদ্ধতি

এখন আমি আপনাদের সামনে তরবীয়তের পদ্ধতি সম্পর্কে বলব।

(১) শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্বপ্রথম তরবীয়ত হল আযান।

(২) শিশুকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। পেচ্ছাব-পায়খান অনতিবিলম্বে পরিস্কার করা বাঞ্ছনীয়। অনেকে হয়তো বলবে এই কাজটি মহিলাদের। যদিও এটি ঠিক কথা, কিন্তু প্রথমে পুরুষের মনে এই ধারণার উদয় হলে তবেই মহিলার মনেও অনুরূপ ধারণা জন্মাবে। অতএব পুরুষদের কাজ হল মহিলাদেরকে বোঝানো যে, বাচ্চা যদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকে তবে তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতাবোধ কিভাবে সৃষ্টি হবে? কিন্তু অধিকাংশই দেখা যায় যে, এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। .....যখন শিশুর বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না তখন তার অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা কীভাবে বজায় থাকতে পারে? কিন্তু শিশু যদি বাহ্যিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তবে তার প্রভাব অভ্যন্তরীন পরিচ্ছন্নতার উপর পড়বে। সে অভ্যন্তরীণভাবেও পুতঃ পবিত্র হবে কেননা অপরিচ্ছন্নতার কারণে যে পাপ সৃষ্টি হয় সেগুলি থেকে সুরক্ষিত থাকবে। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী একথা প্রমাণসিদ্ধ যে, শিশুর মধ্যে পাপ প্রথমে অপরিচ্ছন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়। যদি বাচ্চার শিশ্নভাগ অপরিচ্ছন্ন থাকে, তবে সে সেই স্থানটিকে চুলকাতে থাকে এবং সে প্রকার আনন্দ পায়। ক্রমশঃ সে নিজের কাম-শক্তির বিষয়ে অনুভুতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। যদি তাকে পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে বলা হয় যে, সেই সকল স্থানকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ধোওয়া আবশ্যক তবে সে যৌন বিষয়ক অপকর্ম থেকে বহুলাংশে সুরক্ষিত থাকতে পারে। এই প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ প্রথম দিন থেকেই আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) বাচ্চাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ানো উচিত। এর ফলে বাচ্চাদের মধ্যে কামনা-বাসনা দমন করার অভ্যাস তৈরী হয়। এই ভাবে সে অনেক পাপ থেকে রক্ষা পেরে পারে। চুরি,ছিন্তাই ইত্যাদি অনেক মন্দকর্ম কামনা-বাসনাকে দমন না করার কারণেই তৈরী হয়ে থাকে। কেননা এমন মানুষদের মধ্যে কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি থাকে না। এর কারণ হল যখন শিশু দুধ খাওয়ার জন্য কেঁদেছে তখনই তার মা তাকে পান করিয়েছে। এমনটি করা উচিত নয় বরং নির্দিষ্ট সময়ে দুধ পান করানো উচিত। এবং বেশি বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে যথা সময়ে খাবার খাওয়ার অভ্যেস গড়ে তোলা উচিত। এর ফলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্টাবলী তৈরী হয়। (১) সময়ানুবর্তিতার প্রতি সচেতনতা গড়ে ওঠে। (২) কামনা-বাসনাকে দমন করা (৩) সুসাস্থ্য (৪) দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার অভ্যেস তৈরী হওয়া। কেননা এমন শিশুদের মধ্যে স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণতা থাকবে না বরং তারা সকলের সঙ্গে আহার করবে (৫) তাদের মধ্যে অপচয় করার কু-অভ্যেস থাকবে না। যে সকল বাচ্চারা সব সময় খাওয়ার জিনিস নেয় তারা সেগুলির মধ্য থেকে কিছু নষ্ট করে এবংকিছুটা খায়, কিন্তু যদি তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাওয়ার জিনিস দেওয়া হয় তবে সেগুলির মধ্যে থেকে একটুও নষ্ট করবে না। এইভাবে বাচ্চাদের মধ্যে স্বল্প জিনিস ব্যাবহারের এবং সেটির দ্বারা নিজের আকাঙ্খা পুরণ করার অভ্যেস তৈরী হবে। (৬) লোভ-লালসা দমন করার অভ্যেস তৈরী হবে। যেমন- বাজারে চলতে চলতে বাচ্চা একটি জিনিস দেখে এবং নেওয়ার জিদ করে। যদি সেই সময় তাকে সেটি কিনে না দেওয়া হয় তবে সে তার আকাঙ্খাটিকে দমন করে নিবে। বড় হয়ে অনেক সময় সে নিজের মনের জন্ম নেওয়া লালসার মোকাবেলা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

অনুরূপভাবে বাড়িতে যদি কোন খাওয়ার জিনিস থাকে এবং বাচ্চা যদি সেটি চেয়ে বসে তবে তাকে বলা উচিত যে, খাওয়ার সময় পাবে। এর ফলেও তার মধ্যে নিজের বাসনাকে দমন করার শক্তি তৈরী হবে।

(৪) বাচ্চাকে নির্দিষ্ট সময়ে পায়খান করার অভ্যেস করানো উচিত। এটি তার সাস্থ্যের জন্যও ভাল। কিন্তু এর একটি বড় উপকারীতা হল এর ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার অনুভুতি তৈরী হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পায়খান করলে ক্ষুদ্রান্তের একটি অভ্যেস হয়ে দাঁড়ায় ফলে নির্দিষ্ট সময়েই পায়খানার বেগ আসে। ইউরোপে অনেকে এমন আছেন যারা পায়খানার বেগ অনুভব করে সঠিক সময় বলে দিতে পারেন। কেননা নির্দিষ্ট সময়েই তাদের বেগ আসে। অতএব শিশুদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সমস্ত বাচ্চারা সময়ে কাজ করে তারা নামায, রোযার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং দেশীয় কাজে পশ্চাদবর্তী হওয়ার অভ্যেস তাদের থাকে না। এছাড়াও অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা প্রশমিত হয় কেননা, অহেতুক উত্তেজনার একটি বড় কারণ হল অসময়ে কাজ করার অভ্যেস। বিশেষ করে অসময়ে খাওয়া।। বাচ্চা যদি খেলাধুলা মগ্ন থাকে, আর মা খাওয়ার জন্য ডাকলে না আসে, এর পর বাচ্চা যখন এল মা বলল একটু দাঁড়াও খাবার গরম করে দিই। যেহেতু সেই সময় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকে তাই সেই কান্না ও চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়। এবং অহেতুক উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রদর্শন করে। কেননা সে তখন খেতে আসে যখন সে আর ক্ষুধা সহ্য করতে পারছিল না। এই কারণে সে তুমুল চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়।

(৫)অনুরূপভাবে খাবার অনুমান অনুসারে দেওয়া উচিত। এর ফলে স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার অভ্যেস তৈরী হয় এবং ঈর্ষাপরায়ণতা দূরীভুত হয়।

(৬) বিভিন্ন ধরণের খাবার দেওয়া উচিত। মাংসা, সব্জী এবং ফলমূল দেওয়া উচিত। কেননা, খাদ্যের কারণেও বিভিন্ন ধরণের আচরণ তৈরী হয়। অতএব বিভিন্ন ধরণের আচরণ তৈরী করতে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। শৈশবকালে মাংস কম এবং সব্জী বেশি দেওয়া উচিত। কেননা মাংস উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বাল্যকালে উত্তেজনা কম হওয়া উচিত।

(৭) যখন বাচ্চা একটু বড় হয়, তখন খেলার ছলে তাকে কাজ করানো উচিত। যেমন-অমুক বাসনটি নিয়ে এস। এই জিনিসটি ঐখানে রেখ এস। এই জিনিসটি অমুককে দিয়ে এস। এই ধরণের আরও অন্যান্য কাজ করানো উচিত। একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাকে নিজে স্বাধীনভাবে খেলার অনুমতিও দেওয়া উচিত।

(৮) বাচ্চাকে স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার অভ্যেস করানো দরকার। যেমন- কোন জিনিস তার সামনে রেখে বলা হবে যে এটি তোমাকে এখন দেওয়া হবে না, অমুক সময় দেওয়া হবে। তবে জিনিসটি লুকিয়ে রাখলে হবে না। কেননা, সেই নমুনাটি দেখে সেও এমনটি করবে এবং তার মধ্যে চুরি করার অভ্যাস তৈরী হবে।

(৯) শিশুকে বেশি ভালবাসা দেওয়া উচিত নয়। বেশি চুমু খেলে অনেক অপছন্দনীয় বিষয় সামনে আসে। যে মজলিসে সে যায় সে সেখানেও তার এমন বাসনা হয় যে মানুষ যেন তাকে ভালবাসে। এইভাবে তার মধ্যে চারিত্রিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

(১০) মাতা-পিতার উচিত ত্যাগ স্বীকার করা। যেমন বাচ্চা যদি অসুস্থ থাকে এবং কোন জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ থাকে তবে সেই জিনিস যেন না খায় এবং সেই জিনিস যেন বাড়িতে না আনা হয়। বরং তাকে যেন বলা হয় যে তুমি খাবে না বলে আমরাও খাব না। এর ফলে শিশুর মধ্যে ত্যাগ স্বীকারের গুণ বিকশিত হবে। (ক্রমশঃ.....)

ইং ১৯৩৯ সালে খেলাফত জুবিলী উদযাপন করা হয়। এইজন্য যে এই বৎসরে তাঁর খেলাফতের ২৫(পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই উপলক্ষে হুযুর (রাঃ) জামাতকে বলেন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক পূণ্য কাজে অধিক হতে অধিকতর অংশগ্রহণ করুন। এই বৎসর হুযুর (রাঃ) একটি কমিটি গঠন করেন, য যাদের কাজ এই ছিল 'হিজরি শামসী' (হিজরি সৌর) বৎসর প্রস্তুত করা। তিনি হিজরি সৌর বৎসরের মাসের নাম নিম্নলিখিত রাখেন :-

(১) সুলাহ্ (জানুয়ারী) (২) তবলীগ (ফেব্রুয়ারী) (৩) আমান (মার্চ)
(৪) শাহাদাত (এপ্রিল) (৫) হিজরত (মে) (৬) এহ্সান (জুন)
(৭) ওফা (জুলাই) (৮) জহুর (আগষ্ট) (৯) তবুক (সেপ্টেম্বর)
(১০) আখা (অক্টোবর) (১১) নবুয়ত (নভেম্বর) (১২) ফাতাহ্ (ডিসেম্বর)

এই সব মাসের নাম ইসলামি ইতিহাসের কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে।হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) স্বীয় জামাতের শিশু, বৃদ্ধ, যুবক ও নারী সকলের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতেন। এই জন্য তিনি ঐ সমস্ত সংগঠন প্রস্তুত করেছিলেন যাতে সকলে একই পন্থা ও সংগঠনের দ্বারা কাজ করা শিখে। প্রথমেই তিনি লাজনা ইমাউল্লাহ, খুদ্দামুল আহমদীয়া, নাসেরাতুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া সংগঠন প্রস্তুত করেছিলেন। ইং ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে তিনি আনসারউল্লাহ্ সংগঠন প্রস্তুত করেন, এতে চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধের পুরুষরা অন্তর্ভূক্ত, যাতে জামাতের বৃদ্ধরা অলস হয়ে বসে না যায় এবং তারাও জামাতের কাজে অংশ গ্রহণ করে।

যেমন আমি প্রথমে বলেছি, আল্লাহ মিঞা তাঁর সম্বন্ধে প্রথম থেকে মসীহ মাওউদ (আঃ) কে বলে দিয়েছিলেন, তিনিই মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)। কিন্তু এযাবৎ তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেননি যে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী তার জন্যেই ছিল।

ইং ১৯৪৪ সালে আল্লাহ মিঞা স্বপ্নযোগে তাঁকে জানান তিনিই মুসলেহ মাওউদ। অতঃপর তিনি জুমুআর খোতবায় ঘোষণা করেন আমিই মোসলেহ মাওউদ। এই ঘোষণা শুনে আহমদীরা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং একে অপরকে 'মোবারকবাদ' (আভিনন্দন) দিতে থাকেন শুধু কয়েকজন কপট ছাড়া যারা তার প্রতি ঈর্ষা করত।

মুসলেহ মাওউদ দাবীর পর তিনি মসজিদ মোবারক কাদিয়ানে মগরিবের নামাযের পর বৈঠক আরম্ভ করেন। এই বৈঠককে 'মজলিস ইল্ম ও ইরফান' বলা হোত। এতে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম্মের কথা মনোরম পদ্ধতিতে বলতেন। এই বৈঠকে একবার তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন," খলিফা স্বয়ং মোজাদ্দের চেয়ে বড় হয় এবং তার কাজ শরীয়তের নির্দ্দেশাবলী বলবৎ এবং 'দীন' (ধর্ম্ম) কে প্রতিষ্ঠা করা। পুনরায় তার উপস্থিতিতে মোজাদ্দেদ কিভাবে আসতে পারে। মোজাদ্দেদ তো ঐ সময় আসে যখন ধর্ম্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়"।এইরূপে একবার তিনি বলেন, " যদি ইমাম বাহিরের মজলিসে এসে বসে তাহলে এইজন্য নয় যে, জনসাধারণের উত্তর দিতে থাকবে। .....খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্ট, তার খলিফা এবং সংস্কারকদের কাজ ডিবেটিং ক্লাবে বসে থাকার জন্য নয়। পক্ষান্তরে জনসাধারণকে আল্লাহতা'লার ভক্তি-ভালবাসার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই জন্য ঐ ব্যক্তি তার কাছ থেকে উপকার লাভ করতে পারে যে মজলিসে শান্তভাবে বসে থাকে"।

ইং ২৪ শে জুলাই, ১৯৪৪ সালে হযরত সৈয়্যেদ আজিজুল্লাহ শাহ্ সাহেবের পুত্র হযরত সৈয়্যেদ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের কন্যা সৈয়্যেদা বুশরা বেগম সাহেবার সাথে তার বিবাহ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলেছি তিনি প্রতিবার সঠিক সময়ে মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগীতা করেন। যখন ভারতীয় মুসলমানরা নিজেদের জন্য একটা পৃথক দেশ গঠন করার সিদ্ধান্ত করলেন তখন তিনি এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য অনেক কাজ করেন এবং সকল আহমদীগণকে আদেশ দেন, তারা পাকিস্তান গঠন করার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করুন।ইং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তখন তিনি কাদিয়ানে একটি শিবির নির্মান করেন। যেখানে আশে-পাশের এলাকার মুসলমানেরা আশ্রয় নেওয়ার জন্য পৌঁছে যান। কেননা কাদিয়ানে খোদার ফযলে হিন্দু-শিখেদের অক্রমণ থেকে অপেক্ষাকৃত সংরক্ষিত ছিল। দেশ বিভাগের পর কাদিয়ান ভারতের ভাগে এসে গিয়েছিল। তিনি স্থির করলেন সব আহমদী কাদিয়ান ছেড়ে যাবে না। অতএব তার নির্দেশে প্রায় ৩১৩জন আহমদী কাদিয়ানে থেকে যায়। তিনি তার পুত্র মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবকে কাদিয়ানে থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি এখন ও কাদিয়ানে জামাতের সেবা করছেন। তিনি স্বয়ং সবাইকে পাকিস্তান পাঠিয়ে অনেক দিন পর কাদিয়ান থেকে লাহোরে আসেন। এখন যেহেতু কাদিয়ান যা আহমদীদের কেন্দ্র ছিল ভারতেই থেকে গেল। এইরূপে তিনি পাকিস্তানে জামাতের নতুন কেন্দ্র গঠন করলেন যার নাম রাখলেন 'রাবওয়া'। রাবওয়ার অর্থ উঁচু জায়গা। প্রথমাবস্থায় না এখানে জল , না গাছপালা ছিল। কিন্তু তার সাহসিকতা ও দোওয়ায় রাবওয়া বসবাসের উপযুক্ত স্থান হওয়ার সূচনা হোলো। আল্লাহ মিঞা ভূতল থেকে জল নির্গত করলেন। বৃষ্টিও অধিক হতে থাকল। গাছ-গাছড়া চতুর্দিকে দৃষ্টিগোচর হোল। প্রথম প্রথম এখান থেকে দিনে দুটো গাড়ী যাতায়াত করত। রাতে কোন গাড়ী যাতায়াত করত না। দিনের বেলায় শুধু কিছু চলত। হুযুর (রাঃ) এর প্রচেষ্টায় যখন এখানে শহর জনবহুল হয়ে গেল, তখন রাবওয়ায় দস্তর-মাফিক ষ্টেশন হয়ে গেল। বাস, মোটর ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। এখানে বিদ্যুৎ, ফোন, গ্যাস এসে গেল এবং এই ভাবে খোদার মহিমায় অনুর্বর ভূমি জনবসতিতে রূপান্তরিত হল।

তিনি (রাঃ) আল্লাহতা'লা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং কোরআন শরীফের সঙ্গে অত্যন্ত ভক্তি ও ভালবাসতেন । তিনি সারা জীবন কোরআন শরীফ হৃদয়ঙ্গম করা ও শিক্ষাদান করে গেছেন।শত্রুরা সারা জীবন তাকে উত্তক্ত করে গেছেন। এই শত্রুরা জামাতের ভিতরেও ছিল এবং বাহিরেও ছিল।জামাতের ভিতর যে শত্রু থাকে, তাকে 'মুনাফেক' (কপট) বলা হয়। এই সমস্ত লোক সম্মুখে বন্ধুরূপে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শত্রু হয়ে থাকে এবং যখনই এরা সুযোগ পায় ক্ষতি করতে চেষ্টা করে।

মুনাফেকরা সারা জীবন তাকে কষ্ট দিয়েছে। তার খেলাফতের সময়ে মিস্ত্রিরা, মিসরিরা হাঙ্গামা করেছে। এ ছাড়া আরও অনেক মোনাফেকরা জামাতের মধ্যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। যারা অহমদী নন তারাও নানা রকমের কষ্ট দিয়েছে। তার সম্বন্ধে বাজে কথাও গালাগালি করত। কিন্তু তিনি সহাস্যে সবকিছু সহ্য করে নেন এবং কখনও কাহাকেও গ্রাহ্য করেন নি। তাকে আল্লাহ মিঞা ঐশীবাণীর মাধ্যমে 'উলুল আযম' (দৃঢ়সংকল্পকারী) বলেছিলেন এবং তিনি সংকল্প ও সাহসিকতার সঙ্গে সবাইকে পরাজিত করেন।

ইং ১৯৪৫ সালে যখন তিনি মসজিদে মোবারক রাবওয়াতে আসরের নামায পড়িয়ে ফিরছিলেন তখন একজন শত্রু ছুরির দ্বারা তার উপর আক্রমণ করেন। তার গলায় অত্যন্ত তীব্র আঘাত লাগে, কিন্তু খোদাতা'লা তাকে রক্ষা করেন।অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার মধ্যেও কর্ম্মব্যস্ততা থেকে ক্ষ্যান্ত হননি এবং ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গেছেন। তফসীর সগীরের সমস্ত কাজ তিনি অসুস্থতার মধ্যে করেন। সারা সারা রাত জেগে কোরআন শরীফের তফসীর (ব্যাখ্যা) লিখতেন। তিনি কোরআন শরীফের যে সংক্ষিপ্ত তফসীর লেখেন, তার নাম 'তফসীর সগীর'। একটা তফসীর বিস্তৃতভাবে তাকে 'তফসীর কবীর' বলা হয়। তার অভ্যাস ছিল তিনি চলতে ফিরতে পড়তেন, শুধু খুব অসুস্থতা ছাড়া যখন তিনি অত্যন্ত দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। নতুবা আমরা তাকে সর্বদা চলা-ফেরা করতে দেখেছি। হাতে কোরআন শরীফ নিয়ে চলা-ফেরা করতে করতে পড়তেন।

আল্লাহ মিঞা যেমন ভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত মেধাবী, বড় বড় সমস্যা অত্যন্ত দ্রুততার সহিত সমাধান করে দিতেন। তার অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কোনও ব্যাপারে যদি অন্যায় দেখতেন, তৎক্ষনাৎ তিরষ্কার করতেন, তা নিজের ছেলে বা অন্য যে কেউ হোক। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয়ও নম্র ছিলেন। যদি একবার তিরষ্কার করতেন তো অন্য সময়ে সান্ত্বনা দিতেন। এ কারনে সব লোক তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেনএবং তাকে (রাঃ) নিজের সত্যিকার শুভাকাঙ্খী মনে করতেন। জামাতের এত বেশী কাজ সত্বেও তিনি কখনও ক্লান্ত হতেন না। অত্যন্ত উৎফুল্ল মেজাজের ছিলেন। সদাসহাস্য বদন ছিল। প্রায়ই সমস্ত পরিবারকে নিয়ে পিকনিক যেতেন। ছোট বা বড়দের থেকে কোনও স্নায়বিক দূর্বলতা ছিল না। সমস্ত জামাত কে শিশু শুলভ স্নেহ-ভালবাসতেন। পক্ষান্তরে প্রায়ই লোকে বলে, আমাদের মনে হোত হুযুর (রাঃ) নিজ সন্তানদের চেয়ে আমাদের স্নেহ ও ভালবাসতেন।

ছোট শিশুদের সঙ্গে অত্যন্ত আদর করতেন এবং তাদের সঙ্গে কৌতুক করতেন। আমি একবার তার কাছে কয়েকটা চিঠি নিয়ে গেলাম যা বাহিরের কোন একটা দারোয়ান আমার নিকট সমর্পন করেছিলেন। তিনি ঐ সময় ভোজন করছিলেন। আমাকে দেখে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি একটি অন্যায় করেছ এবং এর জন্য আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম, জানিনা এমন কি কাজ করেছি। বললেন, তোমার অন্যায় এটা যে, তুমি আমার মেয়ের মেয়ে এবং শাস্তি এটাই দেব তোমাকে আদর ও স্নেহ করব।তিনি (রাঃ) যত স্নেহও আদর করতেন, 'তরবিয়ত' (শিক্ষা-দীক্ষা) এর ব্যাপারে তেমনই স্মরণ রাখতেন। সূচনাতে যখন রাবওয়া নির্ম্মিত হয়, তখন আমাদের ঘর কাঁচা ইঁটের ছিল। ঘরের সাথে দু-একটা দোকান ছিল। একবার আমি দোকান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে ফিরছিলাম। তিনি নামায পড়াবার জন্য যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, কোথা থেকে আসছ? আমি বললাম, বাজার থেকে। আমাকে কিছু বলেন নি। কিন্তু মাকে এসে বললেন, ঠিক আছে এ এখন ছোট, কিন্তু দোকানে একাকি পাঠান উচিত নয়। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মান

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 9 th March, 2017 Issue No. 10

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর ....

করতেন এবং কাহাকেও মন্দ ভাবতেন না। একবার পরিষ্কার কারী একজন ঝাড়ু দার তার এক পুত্রের মুখে চুমা খান। এই জন্য শিশুরা ঐ বাচ্চাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করল ম্যাথর তোমাকে চুমা খেয়েছে এবং তুমি নোংরা হয়ে গেছ। হুযুর যখন জানতে পারলেন তখন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঝাড়ুদার কোথায় কোথায় তোমাকে আদর করেছে। শিশুটি মুখমন্ডলে আঙুল রেখে বললেন, এই স্থানে। হুযুর (রাঃ) শিশুটির জড়িয়ে ধরে ঠিক সেই স্থানে চুমা খেলেন এবং এইরূপে শিশুদের এই উপদেশ দিলেন, কোন মানুষই নিকৃষ্ট নয়।

তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল। কোরআন পাঠের সময় মন চাইত যেন শুনতেই থাকি। এমন বক্তৃতা করতেন যা যথেষ্ট উপভোগ্য ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করতেন এবং শ্রোতারা মনে করত বক্তৃতা চলতেই থাকুক বরং শেষ যেন না হয়।

ইং ১৯৫৪ সালের পর তিনি অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এবং খুব দূর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারদের কথা মত এবং জামাতের পিড়াপিড়িতে তিনি চিকিৎসার জন্য ইং ১৯৫৬ সালে ইউরোপ গমন করেন। চিকিৎসা ব্যতীত সেখানে আহমদী মিশনের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন এবং সেখানকার আহমদীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করেন । চিকিৎসার দ্বারা তার কিছুটা উপকার হলেও কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ্য হতে পারেন নি।

অবশেষে ইং ৮ই নভেম্বর ১৯৬৫ সালে রাত প্রায় ২টোয় আল্লাহ্ মিঞা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কে নিজের কাছে ডেকে নেন। তার মৃত্যুর খবর জানাজানির পর নিকট ও দূরের সহস্র সহস্র আহমদীরা রাবওয়াতে যাত্রা করা আরম্ভ করে দেয়।

পরের দিন জামাত সমবেত হয়ে নিজেদের নতুন ইমাম নির্বাচিত করেন এবং হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) কে নিজেদের খলিফা নির্বাচিত করে তার নিকট বয়আত করেন। ইং ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যায় তার জানাযা (শব) বেহেশ্তি মাকবারায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলিফাতুল

মসীহ সালেস অসংখ্য আহমদীদের সাথে তার জানাযার নামায সম্পন্ন করেন। তার (রাঃ) কবর তারই মাতা হযরত উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যেদা নুসরাত জাঁহা বেগম (রাঃ) এর পাশে প্রস্তুত করা হয়।

শিশুগণ! সদা সর্বদা দোয়া করতে থাক, খোদা আমাদিগকে 'তৌফিক' (শক্তি সামর্থ্য) দান করুন যেন আমরা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর ন্যায় ইসলামের 'খাদেম' (সেবক) এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর সঙ্গে সত্যিকার প্রেম স্থাপন কারী হই এবং এ ও দোয়া কর, আমাদের প্রিয় খলিফা দীর্ঘায়ূ হয়, আমাদের জামাতে কখনও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ না হয়। আমরা একতা বদ্ধ হয়ে সব কাজ করি, আমাদের খলিফা যে নির্দেশ আমাদিগকে দেবেন আমরা মান্য করি, কেননা খেলাফতের মধ্যে অসংখ্য 'বরকত' (কল্যাণ) নিহিত আছে। যেমন বৃক্ষের শাখা যতদিন বৃক্ষের সাথে যুক্ত থাকে, ততদিন চির-হরিৎ থাকে এবং যখন তা বৃক্ষ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়,তখন শুষ্ক হয়ে যায়। অতএব যতদিন পর্যন্ত জামাতের লোক খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, ততদিন তাদের ঈমান তাজা থাকে। যখন কোন হতভাগা খেলাফতের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে, তখন আল্লাহ্ মিঞা তাকে শুষ্ক শাখার মত করে দেয়, যার কোন মূল্যায়ন হয় না।

তবে শিশুগণ! এই ছিল হযরত ফযলে ওমর (রাঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত যা আমরা তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম।

তোমার নাম মাহ্মুদ। তোমার প্রতিটি কাজ উত্তম। তোমার প্রত্যেক ক্রিয়া-কর্ম ও পদক্ষেপ উত্তম। তোমার সারাটি জীবন 'তাকওয়া' (খোদাভীতি) র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তোমার সূচনা উত্তম ছিল, তোমার সমাপ্তিও উত্তম।হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বছর :-

ইং ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৬ - মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

ইং ১৮৮৯ - জন্ম

ইং ২৬শে মে, ১৯০৮ - হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মৃত্যু।

ইং ১৯১৪ - তিনি (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন।

ইং ১৯১৬ - হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর বড় চাচী সাহেবা তার কাছে বয়আত করেন।

ইং ১৯২০ - দারুত তবলীগ আমেরিকার ভিত্তি স্থাপন।

ইং ১৯২২ - লাজনা ইমাউল্লাহ প্রতিষ্ঠা।

ইং ১৯২৩ - শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা।

ইং ১১ই জুলাই ১৯২৪ - ওয়েম্বলে কনফারেন্সের জন্য ইউরোপ গমন।

ইং ১৯২৮ - জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা।

ইং ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৮ - অমৃতসর-কাদিয়ান রেল উদ্বোধন, প্রথম গাড়ী কাদিয়ানে থামে।

ইং ডিসেম্বর ১৯৩০ - তার বড় ভাই হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তার নিকট বয়আত গ্রহণ করেন।

ইং ১৯৩১ - অল ইন্ডিয়া কাশ্মির কমিটি গঠন।

ইং ১৯৩৪ - তাহরিক জদীদের প্রতিষ্ঠা।

ইং ১৯৩৭ - মিশরীয়দের হাঙ্গামা।

ইং ১৯৩৮ - খুদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা।

ইং ১৯৩৯ - খেলাফত জুবিলী

ইং ১৯৪০ - হিজরি সৌর বৎসর প্রবর্তন।

ইং ১৯৪০ - আনসার উল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা।

ইং ১৯৪৪ - মুহলেহ মাওউদ দাবী।

ইং ৩১শে আগষ্ট ১৯৪৭ - কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানের দিকে হিজরত।

ইং ১৯৪৮ - নতুন কেন্দ্র রাবওয়া প্রতিষ্ঠা।

ইং ১৯৫২ - হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ) এর জীবনাবসান।

ইং ১৯৫৪ - তার উপর আক্রমণ।

ইং ১৯৫৫ - ইউরোপ সফর ।

ইং ১৯৫৮ - ওয়াকফে জদীদের প্রতিষ্ঠা।

ইং ৮ই নভেম্বর ১৯৬৫ - মৃত্যু

একের পাতার পর ..

আনন্দের সাথে বলে থাক যে, আঁ হযরত (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর জন্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করে থাক। কাফেরদের মোকাবিলায়ও তোমরা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার কর যে, তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। তথাপি আমি বুছি না হযরত ঈসা (আ.)-এর মুত্যুতে কোন পাথর আপতিত হয় যে, রক্তচক্ষু করে নাও। আমাদের কোন দুঃখ হত না যদি আঁ হযরত (সা.)-এর মুত্যুর শব্দ শুনে এমন অশ্রু প্রবাহিত হত। কিন্তু পরিতাপ তো এটিই যে, খাতামন্নাবীঈন (সা.) এবং সারওয়ারে আলম (জগতের বাদশা) সম্পর্কে তোমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মৃত্যু স্বীকার কর। আর যে ব্যক্তি নিজেকে আঁ হযরত (সা.)-এর জুতার ফিতা খোলার উপযুক্তও মনে করে না তাঁকে জীবিত বিশ্বাস করে থাক। তাঁর সম্পর্কে মৃত্যুর শব্দ উচ্চারণ করতেই তোমাদের ক্রোধ এসে যায়। আঁ হযরত (সা.) এখনও পর্যন্ত জীবিত থাকলে কোন অসুবিধা ছিল না। কারণ তিনি (সা.) সেই মহান হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি (সা.) সেই কর্ম পদ্ধতি দেখিয়েছেন যার উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত আদম থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তায় যে পরিমাণ প্রয়োজন পৃথিবীবাসী এবং মুসলমানদের ছিল সে পরিমাণ প্রয়োজন মসীহ্র সত্তার ছিল না।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন ২০ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৮)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir